নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৪ পৃঃ ৩-২৪
© ২০০৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পর্দার আজগুবীকরণ, আধুনিকতা ও সভ্যতার শৃংখলার অংশ

সায়েমা খাতুন*

১. ভণিতা

আধুনিককালে পর্দাপ্রথাকে দেখা হচ্ছে, অপাশ্চাত্যের সমাজের, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের ধর্ম ও ঐতিহ্য উৎসারিত বলে এবং তারই দ্বারা অনুমোদিত একটি গতিহীন, অনড় ও কঠোর সংস্কার হিসেবে, উন্নত আধুনিক উদার জীবনধারা গড়ে তুলতে যার অপসারণ আবশ্যিক ও অবশ্যম্ভাবী।[১] পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারায় আধুনিক আলোকিত মানুষ একে বিভিন্নভাবে ব্যাখা করছে অনগ্রসর সংস্কারগ্রস্থ সমাজে নারীর দূরাবস্থা ও বন্দীদশা হিসেবে; নারীর সকল কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় মতাদর্শ ও আচরণ রীতি বলে।[২] এর থেকে বেরিয়ে জনসমক্ষে আসবার মধ্য দিয়ে এরা সমাজের অগ্রসরতা ও নারী প্রগতিকে চিহ্নিত করে থাকেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল আলোকিত মহলে পর্দা প্রত্যক্ষভাবে নারীর পশ্চাদপদতার চিহ্ন বলে গণ্য। এবং কাম্য লক্ষ্য হল তাকে ঘুচিয়ে দেয়া। এই আলোকায়নের প্রকল্প হল নারী ও পুরুষের একত্র কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যাকে দৃশ্যতঃ লিঙ্গ সমতা বিধানের নিদান/উপায় মনে হয়। পর্দা প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে জনজীবনে পুরুষের সাথে সমান অংশ লাভের সুযোগ গ্রহণকারী হিসেবে নতুন আধুনিকা নারীর আত্ম-উপলদ্ধিও ঐতিহ্যের নাগপাশ মুক্ত, বিকশিত, উন্নত, সভ্য ও আত্মগর্বী। আলোকিত জাতির আলোকিত নারী। এ জায়গা থেকে আকছার পর্দা প্রথাকে স্রেফ বিশেষ ধরনের পোশাক দিয়েও বোঝানো হয়। প্রগতি ও মুক্তির এমনই এক সরলীকরণ ঘটে যে, তার অর্থ গিয়ে পৌঁছায় বিশেষ ধরনের পোশাক পরা না পরার ভঙ্গীতে গিয়ে। তা দিয়ে নির্ণয় করা শুরু হয়েছে সমাজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান ঃ এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া।[৩] নারীর চাল-চলন, ভঙ্গী, পোশাক-আশাক হয়ে পড়ে অন্তহীন আলোচনার বিষয়।

পর্দাকে হয় সংস্কারপন্থীদের আধুনিক হয়ে উঠবার আগ্রহে, নয় রক্ষণশীলদের পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের তোড়ে আত্মসত্ত্বার অবলম্বন রূপে আবির্ভূত হতে দেখা গেছে এক দ্বৈরথে। সংস্কারবাদী নারী জাগরণ বা নারীর মুক্তির ভাবনাতে এসেছে একটা শাদা-কালো নঞঅর্থে। কিভাবে নারীকে, বিশেষ করে নারীর যৌনতার নিয়ন্ত্রণের মতাদর্শ হয়ে পর্দা ও অবরোধ নারীর অধঃস্তনতাকে জারী রাখছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমাজ চিন্তক ও সংস্কারকদের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ই- মেইল : sayemakhatun@yahoo.com

পর্দা মতাদর্শে মূল বিভাজনটি আসলে পরিসরগত। নারী ও পুরুষের মধ্যকার এক ধরনের আড়াল: নারীর জগত/ পুরুষের জগত, মহিলা মহল/পুরুষের মহল, সদর মহল/অন্দর মহল, ঘর/বাহির। নারী ও পুরুষের মধ্যকার এই আড়াল, এই ঘেরা-বেড়া, সীমান্ত রেখা কোন সহজাত বা স্বাভাবিক ভৌগলিক রেখা নয়। বরং নির্মিত। একটা গঠিত প্রাচীর। এই প্রাচীর আবহমানকাল ধরে অনাদিকালের স্রোতে ভেসে আসেনি। এই আড়াল, যাকে আমরা পর্দা বলছি, তার নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অর্থ ও তাৎপর্যও গঠন করা হয়েছে বহু রকম বয়ান ও কথামালায়। এই অর্থ ও তাৎপর্য আবার বারংবার সংস্কার ও পরিশীলন, নির্মান ও অবিনির্মানের দ্বারা এক এক সময় হয়ে উঠেছে এক এক রকম। বিভিন্ন। অথচ এই বৈচিত্র্যকে পরিবেশন করা হচ্ছে বিশেষ একটি বৈচিত্র্যহীন গৎবাঁধা স্বরে। সেটা আবার এমনই শক্তিশালী যে, এর বাইরে গেলেই পশ্চাদপদতার লেবেল সেঁটে যাওয়ার ভয়।

পর্দা পরিণত হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশ্বিক সম্প্রসারণের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতায় অপাশ্চাত্যের সনাতনী ধাঁচের সমাজের রক্ষণশীলতার প্রতীকে যা আধুনিক জীবন ধারার বিকাশকে বাঁধাগ্রস্থ করে। উন্নয়নকে ঠেকিয়ে রাখে। এভাবে তা হয়ে ওঠে সভ্যতার পরিপন্থী। অসভ্য ও বর্বর সমাজের বিধান। আবার পর্দা কিভাবে ইতিবাচক ও প্রকৃতপক্ষে সেটা নারীর মর্যাদা রক্ষায় সৃষ্ট, পুরুষালী স্বাভাবিক আক্রমনাত্মক আচরণ থেকে সেটা সুরক্ষা প্রদান করতে সক্ষম, - তা-ও এই আলোচনার একটি বিপরীতাত্মক আবশ্যিক ভাবনা। এই ধরনের বিপরীত জোড় কথামালার কাঠামো খাড়া হয় "পর্দা" কে অবধারিত ধরে নেওয়ার মধ্যে।

কিন্তু পর্দা চলমান ও ঘটমান। সময়ে কিংবা কোন দেশে একভাবে স্থির একটা ছবি কিংবা জীবাশ্ম হয়ে জমে যায়নি, বরং বিভিন্ন ধরনের পক্ষের তৎপরতায় তা ক্রমাগত ঘটে চলছে। পর্দা একটি ঘটমান বাস্তবতা, যাতে রয়েছে ক্ষমতার পক্ষ-প্রতিপক্ষের অসম অংশ গ্রহণ। তার পুনঃপুনঃ নির্মাণ ঘটে ইতিহাসের কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে এবং এর নিরন্তর মোকাবেলা ও সমঝোতায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে, নারী ও নারীর মধ্যে, গরীব ও ধনীর মধ্যে, উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনেক জটিল পরস্পরপ্রবিষ্ট গিঁট, জোড়া ও ছেঁড়া-খোঁড়া সম্পর্কের জালে পর্দা গ্রথিত।

পর্দার গৎবাঁধা ধারনায় মুসলমান নারীদের পরিচয়ের সাথে অনিবার্য করে ফেলা হয়েছে। মুসলিম নারী ও পর্দা যেন একই সুঁতোয় অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। ধর্মগ্রন্থের অনুশাসনে মুসলমান নারীরা আটকে আছে মধ্যযুগীয় মনোভাবের নিগড়ে, যা থেকে তাদের পরিত্রাণ দরকার। অতএব, অগ্রসর জীবনে এগিয়ে যেতে হলে পর্দার অবরোধ ভেঙে তাঁদের বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কোন গতি নেই। মুসলমান নারীর স্টিরিওটাইপের সাথে পর্দা ইতোমধ্যে

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। পর্দার প্রসঙ্গ ছাড়া মুসলিম নারীদের সম্পর্কে কথা বলা মুশকিল হয়ে পড়েছে। মুসলিম সমাজে লিঙ্গীয় সম্পর্ক প্রসঙ্গে আবিশ্যকভাবে পর্দার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হচ্ছে । মুসলমান নারীদের জীবন অনুধাবনে লিখিত গ্রন্থগুলোর নামকরণেও এই একই প্রবণতার সাক্ষর "Frogs in a Well", "Beyond the Veil", "Belonging to Other's", (জেফারি ঃ ১৯৭৯, কোটালাভা ঃ ১৯৯৩) ইত্যাদি। মুসলমান নারীর ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে কালো বোরখায় আবৃত কুপমন্ডুক হিসেবে।

সনাতনী সমাজের স্থানিক ধাচেঁর পুরুষতন্ত্র (যার গঠন উপনিশিকীকরণ প্রক্রিয়া থেকে স্বাধীন-স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয়) এই উদারনৈতিক প্রগতিশীল মোকাবেলার সম্মুখে পড়ে পশ্চাদপদতার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি রূপে। এতে অভিযুক্ত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায় ধর্ম, ঐতিহ্যিক সমাজের সংস্কার ও পুরুষতন্ত্র; কিন্তু রেহাই পায় বৃহত্তর ক্ষমতা সম্পর্ক-উপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। অথচ পর্দার গোটা ডিসকোর্সই গড়ে উঠল পরিষ্কারভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বের অধীনে বৃটিশ-ভারতের প্রজার সভ্যকরণ মিশনের অংশ রূপে। এই সময়ে পর্দার পুনর্বিন্যাসের পুরো বিষয়টিই সভ্য করে তোলার এবং সভ্য হয়ে ওঠার অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই "হয়ে ওঠা"র অর্থ একই সাথে পশ্চিমি হওয়া ও না-হওয়ার এক জটিল সংমিশ্রণ। একই অঙ্গে দেশী ও বিদেশী, জাতীয় ও বিজাতীয় হওয়া। উপনিবেশনের ভেতর দিয়ে এক ধরনের খর্বকায় বিকাশ। এই পুনঃর্বিন্যস্ত, সংস্কৃত, সুশীল ও সভ্য হয়ে ওঠা একই সঙ্গে অধীনস্ততার বিন্যাসকে ঢেলে সাজায় এবং আবার পশ্চিমের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী রচনা করে তার স্বাভাবিকীকরণ করে। এতে অনুদ্ঘাটিত ও অদৃশ্য থাকে পর্দা কিভাবে উল্টো দেশীয় নারীর সভ্যভব্যকরণের আলোকায়ন প্রকল্প প্রসূত এবং উপনিবেশিত জনগণের প্রতিরোধ এবং সমঝোতার প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আত্মীকরণ।

আধুনিক আইনী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে পর্দা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে আইনগত বাধ্যবাধকতা দিয়ে। বিশেষভাবে আবৃত পোষাক, বোরখা কিংবা হিজাব বা অন্য কিছু পরা না পরা তখন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনকে ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে আইনী- বেআইনী বিষয়ে। আধুনিক রাষ্ট্রে পর্দা অনুশাসন থেকে শাসনে পরিণত হয়। যেমন, বৃটেন ও ফ্রান্সে প্রাতিষ্ঠানিক আইন দ্বারা একে নিরোধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে, আবার এর বিরুদ্ধে মুসলমান নারীরা সংগঠিত হয়ে আইনী লড়াই করছেন। আধুনিক তুরস্কে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সেখানে সেকুলার ও রক্ষণশীলদের তীব্র বাদ-বিসম্বাদের একটি বড় জায়গা হল হিজাব ও পর্দা। আবার ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পর্দা রাষ্ট্রীয় আইনী অনুশীলনের অন্তর্ভূক্ত। আধুনিক রাষ্ট্রে বসবাসরত বহুজাতি-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম পক্ষের জন্য তা সাংঘাতিক শক্তিশালী একটি প্রতীকে পরিণত হয়।

পর্দার ভাবনাকে আমরা দেখতে পারি কয়েকটি গুচ্ছে।

প্রথমতঃ পর্দা নারী ও পুরুষের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক সংগঠন করে। নারী ও পুরুষের যৌনতার সম্পর্কের একটি ধরন হিসেবে পর্দাকে বিবেচনা করা যায়, যেখানে নারী ও পুরুষের যোগাযোগকে বিশেষ রকমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং একই সাথে এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যে তা কোনভাবেই শ্রেনীবিযুক্ত করে বোঝা যাবে না। বাংলার প্রেক্ষিতে লিঙ্গীয় ও শ্রেনী সম্পর্ক গঠনে যে ঔপনিবেশিক আবিষ্টতা ক্রিয়াশীল ছিল সেখান থেকেই পর্দার পুনঃরাবিষ্কার ঘটে; বৃটিশদের নতুন ব্যবস্থাপনায় একে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করা হয় ভিক্টোরীয় মতাদর্শের ছায়ায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যৌনতার সম্পর্কের নমনীয়তা এবং স্থানীয় বৈচিত্র্য ও এর ওপর সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তাতে আমূল পাল্টে যায়। এখান থেকেই **দ্বিতীয় গুচ্ছের** ভাবনার উৎপত্তি। এই প্রথম ও দ্বিতীয় গুচ্ছ অঙ্গাঙ্গীভাবে লিপ্ত। তার মানে দাঁড়ায় যে, বাংলায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের গড়ন, যৌনতার সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ ঔপনিবেশিকতার ভেতর দিয়ে গঠিত বলে ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ককে পশ্চাদপটে রেখে এই ছবিটা দেখতে হবে। **তৃতীয়** গুচ্ছটি হল, আত্ম-পরিচয় নির্মাণ ও তার সীমানা বা ঘেরা-বেড়া বাধাঁ। সম্প্রদায়ের পরিচয় হিসেবে যেসব প্রতীকী দ্রব্য লোকে ব্যবহার করে, যে ধরনের আচরণ দ্বারা সীমারেখা টানে তার মধ্যেও পর্দার কাজ গুরুতর ও শক্তিশালী। সম্প্রদায়ের সীমা ও প্রতীক নির্মাণে পর্দার প্রতিপত্তি স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে সাংঘাতিক রকমের। সেখান থেকে পর্দা দাঁড়িয়ে যায় প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে। এমনকি তা পশ্চিমের সর্বব্যাপী আগ্রাসনের ও নজরদারীর প্রতিবন্ধক একটি স্ব-শাসিত ঘেরাটোপে পরিণত হয়।

অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলে ঔপনিবেশিক মতাদর্শিক আধিপত্যে পর্দা গঠিত হলেও পরবর্তীতে বিশ্বায়নের দাপটকালে সেটাই আবার হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক (বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে) আত্মপরিচয়ের একটি নিশান। এমনকি আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের হাতিয়ার। সমাজের জীবন্ত রেওয়াজের মধ্যে দেখতে গেলে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যে দিনগত জীবনের বাস্তবতায় এই প্রথার অনুশীলন বৈচিত্রময়। সেটা কেবল ধর্মীয় টেক্সটের লিখিত অনুশাসন নির্ভর নয়। নয় এ কারনে যে, টেক্সেটের ভাষান্তর বিবিধ। ফলে অনুশীলনও।

বাঙালী ভদ্রমহিলাদের পর্দার বিশেষ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কালটি হল উনবিংশ শতকের "রেঁনেসা"।

২. ঐতিহ্য আবিষ্কার এবং তার অনর্থ খোলস, নারী-পীড়ক ভারতীয়দের সভ্যকরণ এবং ত্রাতার বেশে বৃটিশ

উনবিংশ শতকের শুরুতে 'চিরাচরিত ঐতিহ্য' বলে ভারী একটা আশ্চর্য রকমের প্রত্যয়ের প্রবর্তন ঘটে, যাতে মনে করা হল যে, তৎকালীন অধঃপতিত ভারতীয় সমাজে প্রচলিত

সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিব্যবস্থা, রীতি-রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত অবস্থায় একইভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলছে।[৪] এবং সবচেয়ে বড়কথা এইসব অনুষ্ঠানসমূহকে আখ্যা দেয়া হল সমাজ বিবর্তন ও প্রগতিতে পিছিয়ে পড়া এক ধরনের বর্বর যুগীয় অবশেষ বলে। অবরুদ্ধ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, ভূমি ব্যবস্থা, কৃষি সম্পর্কের পরিবর্তন সামাজিক ও পারিবারিক আচার, আচরণ, প্রথাকে কি চেহারা দিয়েছে সেই বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীত এক শাশ্বত, চিরায়ত, সনাতনী সমাজের সময়ে আটকে পড়া একটা চিত্রকল্প জুতা আবিষ্কারের মত করে আবিষ্কার করা হল।

উপনিবেশিক রাষ্ট্রের মিশনারী কর্মসূচি থেকে ভূমি বন্দোবস্তী, প্রশাসনিক ও বিচার নীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমা জ্ঞানের আলোকায়নের ক্রম প্রসার ঘটে যার প্রত্যেকটি বিরাজমান অবস্থায় যে যে বাছাইয়ের সুযোগ থাকে তার শেষ কথা হল, ভারতীয়দের অবশ্যই তাদের "ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ" এর অসারতা উপলব্ধি করতে হবে এবং সভ্যতার যৌক্তিক শৃংখলার অধীনস্ত হতে হবে। কেননা, এই ঐতিহ্য অবক্ষয়িত ও বর্বর। ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশাসনবদ্ধ একটি অবক্ষয়িত সমাজ কাঠামোর ভেতরে ভারতীয় নারী নিপীড়িত ও বন্দী হয়ে আছে। ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশাসন নারীর প্রতি বহুবিধ হিংস্রতাকে গ্রহণযোগ্য করে। পর্দা হল সেই খোলসের এক অনুসঙ্গ। মোটকথা, উপনিবেশবাদীরা ভারতে নিজেদের যুক্তিশীল আইনী ও শাসনব্যবস্থা গড়ে এবং সংস্কারকে দেখছিল "বর্বরদের সভ্যকরণ" এর মহান মিশন হিসেবে। নাবালক শিশুর অভিভাবকত্বের গুরু দায়িত্ব হিসেবে। একটি উদারনৈতিক দরদের জায়গা থেকে ঔপনিবেশিক মন দেশের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই অন্তর্গত চরিত্রে নিপীড়ক ও দমনমূলক বলে পরিবেশন করবার সময় ভারতের নারীদের পীড়িতের আইকন করে তোলে। এইসব ডিসকোর্স প্রস্তুত হয় ভারতীয়দের সভ্যকরণের প্রকল্পকে নৈতিক, আবশ্যিক ও অবশম্ভাবী করে তুলতে।

এই শতাব্দীর তিরিশের দশকের দিক থেকে পশ্চিমা শিক্ষাপ্রাপ্ত আলোকিত ভারতীয়রাও এই ভাবধারাকে আত্মস্থ করে। তিরিশের দশকে গড়ে ওঠা হিন্দু কলেজের যে সব তরুনদের বাংলার রেনেসাঁর পথিকৃত গণ্য করা হয় তারা কম-বেশি এই কোরাসে যোগদান করে। আধুনিক বাংলা শিল্প-সাহিত্যে চিত্রকল্পনায় শাশ্বত বাঙালী নারীর প্রতিমূর্তি আঁকে ঘোমটার আড়ালে আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক, অপারগ, ভাষাহীন এক অক্রিয় সত্তা রূপে।[৫]

বিলেত ভ্রমণকালে সভ্য বৃটিশ জাতির পরিবার ও গার্হস্থ্য-জীবন আধুনিকতাকামী দেশীয়দের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং নিজের সমাজের এর প্রর্বতনার উদ্দীপনা তৈরি করে। কী ধরনের আর্থিক ভিত্তি ও সম্পদ আহরণের সুযোগ অভিজাত ও সাধারণ বৃটিশদের পরিবার ও গৃহস্থালীর মত সংগঠন তৈরি করতে পারে, নারী-পুরুষের জীবনের

কাজ ও অবসরের নানাবিধ সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে, তার কোন মৌলিক পর্যালোচনা এরা হাজির করেননি। মোটকথা এই প্রগতির আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়েছে, একদিকে একটা সাম্রাজ্যিক দেশের এবং অন্যদিকে তার অধীনস্ত দেশের পারিবারিক সম্পর্কের গড়ন, পারিবারিক অর্থনীতি কেমন করে পৃথক হতে বাধ্য, সেই উপলব্ধি ছাড়াই। ফলে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত সমাজকে, অধিপতি ও অধীন সমাজের সংগঠনকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে হামলা ও আত্মরক্ষার, নিপীড়ন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একই সমান বন্দোবস্ত দেয়া হল। সেটা হয়েছিল প্রথমতঃ অভিজাত উচ্চবর্গীয় নারীদের লক্ষ্য করে, নব বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেনী উদ্দীপ্ত এই ভাবধারায় যোগ দেয়। এই ভাবধারার সংস্কার আন্দোলনকেই বলা হয়েছে "নারীজাগরণ", স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি, যদিও বাংলার বৃহৎ সমাজের কৃষক, নিম্নবর্ণ, দরিদ্র শ্রেনীর নারীর জন্য এই 'জাগরণ' মোটের উপর গভীর কোন অর্থ বহন করেনি।

গোলাম মুরশিদ জানাচ্ছেন ১৮৬০ এর দশকে বিজয়কৃষ্ণঃ গোস্বামী ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীস্বাধীনতা পদটি ব্যবহার করেন এবং মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করে নারীমুক্তির আহ্বান জানান। ১৮৭২ সাল থেকে স্ত্রীস্বাধীনতা সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার ব্যাপক হতে শুরু করে (মুরশিদ ঃ ১৯৯৩ ঃ পৃ.১০)। ব্রাহ্মসমাজের উপসনার সময় মেয়েরা পর্দার আড়ালে না বাইরে বসবে এ নিয়ে সমাজ বিভক্তি ও কোন্দলের সূত্রপাত ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ঘটবার ফলে, এ ধরনের বিতর্ক লিখিত বয়ান গঠন করতে শুরু করে যাতে স্ত্রীজাতির পুরুষ জাতির সমকক্ষতা অর্জনের সাথে পর্দাকে জড়িত করা হয়। এই সমকক্ষতাকে প্রত্যাশা করা হয় সভ্যতার প্রগতির বিবর্তনরেখার উচ্চতর ধাপ হিসেবে। কৈলাসবাসিনী দেবীর *বিশ্বশোভা* গ্রন্থের সমালোচনায় অবোধবন্ধু পত্রিকা লিখেছিলেন ঃ

> আজিকালি ইউরোপ ও আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির সমকক্ষতা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভূক্ত। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্ব্বাংশে একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গর্ভধারণ এই বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ থাকুক। আমরা মনে করি যে, অন্যান্য বৈলক্ষণ্য কৃত্রিম, অনিত্য, আগন্তক এবংয় উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক (মুরশিদ ১৯৯৩ ঃ পৃ.১০)।

মেয়েদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষে প্রথম রচনাটি পাওয়া যায় লক্ষীমনি দেবীর। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত "পরাধীনতার কি কষ্ট" নামক প্রবন্ধে তিনি মেয়েদের হীনদশার কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেশাচারকেই সবচাইতে দায়ী করেন। স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ তখনও (পরবর্তীকালের নির্দিষ্ট অর্থে শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রবেশের অধিকার বোঝানো হয়েছে) খুব স্পষ্টভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। এই অর্থ সাধারণভাবে ছিল ঘরের বাইরে বের হওয়া, অবরোধ ঘুচিয়ে প্রকাশ্য স্থানে যাওয়া, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ গ্রহণ

করা, শিক্ষা গ্রহণ, উপাসনালয়ে মিলিত হওয়া ইত্যাদি বোঝাতো। "বোয়ালিয়াস্থ কোন ভদ্র মহিলার"র বক্তব্য (১৮৭১) এ একজন শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের স্ত্রী বলেন, দেশাচার এমন পক্ষপাতদুষ্ট যে, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে গিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে একসঙ্গে উপাসনা করবারও উপায় নেই। এমন কি বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখলে তা-ও দোষ বলে গণ্য হয়। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতা না থাকায় বঙ্গমহিলারা জড় পদার্থের মত। তাঁরা না কোনো ভাল স্থান দেখতে পান, না শুনতে পান কোনো সাধুজনের বানী। তাঁর মতে ইংরেজ মহিলার তুলনায় দেশীয় মহিলাদের যে, এক শতাংশও গুণ নেই, তার কারণ স্বাধীনতার অভাব। সমকালীন আর একজন নারী (১৮৭৫) বাইরে যাবার অধিকার না থাকবার প্রশ্ন উত্থাপন করেন ঃ

স্ত্রীলোকের কিছুই দেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে কত তাহার প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শুনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিলাম না।

রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী ও আরও কিছু মহিলারা এর উল্লেখ করেছিলেন। এই অবস্থাকে বর্ণনার জন্য ঘুরে ফিরে এসেছে "কারাগৃহ", "পিঞ্জর বন্দী বিহঙ্গ", "খাঁচার পোষা পাখি"র "পায়ের শিকল ছিঁড়ে", "পিঞ্জর কেটে" "ঘোমটা চিরে" মুক্ত হবার "ঘুম থেকে জেগে ওঠা"র উপমা। এই শ্রেনীর পর্দানশীন নারীদের পর্দার আবশ্যিক অংশ ছিল অভিভাবকের হেফাজতে দাস-দাসী, লোকলস্কর সহকারে ভ্রমণ (যদি কখনও অতি প্রয়োজন হয়)। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় তার শ্বশুর বাড়িতে থাকবার অভ্যাস করবার কথা বলেছেন এইভাবে ঃ

"পোষা পাখি হইয়া তাদের শরণাগত হইলাম"। মায়ের মৃত্যু শয্যায় যে তিনি তাকে দর্শন করতে পারেন নি তার আক্ষেপ "এই কথাটি আমার মনে ভারী আক্ষেপের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আমি যদি পুত্র সন্তান হইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ।" তিনি বলছেন সেকালে মেয়েছেলেদিগের স্বাধীনতা মোটেই ছিল না; নিজের ক্ষমতায় কোন কর্ম করিতে পারা যাইত না, সম্পূর্ণ পরাধীনা হইয়া কাল যাপন করিতে হইত। সে যেন এক কালে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মত থাকা হইত (মুরশিদ ঃ ১৯৯৩)।"[৬]

দাসী শ্রেনীর নারীদের ক্ষেত্রে পর্দার অর্থ নিশ্চিতভাবেই তা ছিল না। পর্দানশীনতার মূল্যবোধ তাদের ক্ষেত্রে পৃথক। বর্হিজগতের সাথে যোগাযোগ ঘটানোতে নিম্নশ্রেনীর নারীকে উচ্চশ্রেনীর নারীর পর্দা রক্ষায় মধ্যস্থতা করতে দেখা গেছে। রাসসুন্দরীদেরকে বাপের বাড়ি যেতে হত দাস-দাসীর দলের সঙ্গে। চিত্রাদেব লিখছেন "মেয়েরা তো বাড়ি থেকে বেরোতেন না। তাই দাসীরাই ছিল ভরসা" (মুরশিদ ঃ ১৯৯৩ ঃ পৃ.৫৯) (দাসীরা 'মেয়ে' কিনা?)। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রীরা দাসীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের বাসে

চলাফেরা করত। এই শ্রেনীর মহিলারা যে, বিনা বাঁধায় এবং বিনা পর্দায় সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তা-ও ভদ্রতা ও সভ্যতার পরিপন্থী বলে তিরস্কারে উপস্থাপিত হয়।

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রকল্পে উদারনীতিবাদী সাম্য ও স্বাধীনতার ধারণার সাথে নারীর স্বাধীনতাকে স্থাপন করা হয়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধের এই নারী জাগরণের মূল ভাবটা হল ঐতিহ্যের অচলায়তনী খোলস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা। আর বাহির বলে যে জগতটা তৈরি হল, সে জগতের অধিপতি পাশ্চাত্যের ভাব ও ভাবনা। বাইরে আসা মানে পশ্চিমে আসা (লক্ষ করার মত একটা মজার বিষয় হল আধুনিক বাংলায় আমরা বলে থাকি, "আমারা কয়েক বছর বাইরে ছিলাম", "ওর ভাই পড়ালেখা করতে বাইরে গেছে" এবং বুঝাই পশ্চিমে গেছে)। সেই বাইরে আসতে পারাটাই হল উন্নতি। নারীর স্বাধীনতা, মুক্তি, উন্নতিকে প্রকাশ করা হয়েছে আধুনিক পরিবার গঠন ও আধুনিক নারী হয়ে ওঠবার মধ্য দিয়ে।[৭] আধুনিকতা হয়ে উঠেছিল একটি জীবন ব্যবস্থা এবং তাকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে যেন নারীর জন্য মুক্তির প্রতিশ্রুতি রচনা হয়েছিল। সমাজের লিঙ্গীয় অসাম্যকে সরিয়ে নারী-পুরুষের সমমর্যাদার সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্য 'সনাতনী ঐতিহ্যের খোলস ভাঙবার' রূপকল্প রচনা করা হয়েছিল পর্দার অনুশীলনের ফলে জনজীবনে অদৃশ্য নারীকে প্রকাশ্য করে তুলবার মাধ্যমে। তাতে করে পর্দাকে ভাঙবার মধ্যে এক ধরনের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা, সমাজ বদলের ইঙ্গিত সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এই সময়ে রচিত লিখিত বয়ান স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থ রচনা করেছে সভ্যতা ও বর্বরতার ডিসকোর্সে; একভাবে নারীর 'পর্দার বাইরে' এসে জনজীবনে যোগ দেয়ার মধ্যে, যাতে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন হল উন্নত সভ্যতার লক্ষণ; অপরপক্ষে, অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ নারীর দুরাবস্থা হল অসভ্য বর্বর দশার লক্ষণ। পর্দা হল দাসীর চিহ্ন। ফলে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে পর্দার বাইরে আসা, সমকক্ষ হওয়া, উন্নত, প্রগতিশীল, আধুনিক ও সভ্য হওয়া, এক কথায় পশ্চিমাকৃত হওয়া। এই সময়ের নব্য শিক্ষিতদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বেথুন সোসাইটির এক সভার বক্তৃতায় যাতে তিনি বলেন যে, মহিলাদের অশিক্ষিত রেখে কোনো জাতি নিজেদের সভ্য বলে দাবী করতে পারে না। কৈলাসবাসিনী দেবীর পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বামী দূর্গাচরণ গুপ্তকে অনেকের মত স্ত্রী-শিক্ষা ও দাম্পত্যের নতুন আদর্শে দীক্ষিত হতে দেখা গিয়েছিল যার মর্ম ছিল- কোন সমাজ কতটা সভ্যতা বোঝা যায় সেখানে মহিলাদের মর্যাদা কতটুকু তার ওপর। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাসের সাথে বিলেত থাকবার সময় কৃষ্ণভাবিনী দেবীর (১৮৬৪-) "ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা" (১৮৮৫) নামক গ্রন্থে অনুরূপ ভাবের উৎসাহ লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন, মেয়েদের জীবন পুরুষের জন্যই নিবেদিত - এটা অসভ্য সমাজের চিন্তা। সভ্য ও অসভ্যতার পার্থক্যই এখানে। "সমস্ত কুসংস্কার ও অনিষ্টকারী পুরাতন রীতির প্রতি আসক্তি ত্যাজিয়া ইংরেজের সদ্গুণগুলি লাভ করিতে" পারবার জনপ্রিয় ভাবধারা তাকে প্রভাবিত করেছিল।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের শিক্ষিত চাকুরে পুরুষের একটি বড় আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে নতুন ধরনের পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্ক, যেখানে স্ত্রীর ওপর পিতার বদলে স্বামীর প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব। পিতৃতন্ত্র প্রতিস্থাপিত হল স্বামীতন্ত্রে। নাগরিক বেতনভোগী পুরুষের পরিবারের গঠন ও শিক্ষিত স্ত্রীর প্রশ্নেই পর্দা ও অবরোধ প্রথা কঠোরতা প্রবল তর্ক-বিতর্কের জন্ম দেয়। অন্তঃপুরের গার্হস্থ্য জীবনের নিভৃতি ঘুচিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া, ভ্রমণ, সভা-সমিতিতে যোগদানকে দেখা হয়েছিল পর্দার বাঁধা ডিঙিয়ে প্রকাশ্য জনজীবনে অংশ গ্রহণ হিসেবে।

এই পুনর্জাগরণের সমকালীন ঐতিহাসিক লেখকদের কাছেও এই সংস্কার হল নারীদের আধুনিক করে তোলার ইতিবাচক আন্দোলন (মুরশিদ ঃ ১৯৯৩)। এই আলোড়ন হল আধুনিকতার একটা ঢেউ (মুরশিদ ঃ ১৯৯৩ ঃ পৃ.১০)। মুক্ত নারী হল 'আধুনিকা', 'নব্য মহিলা' যাকে চেনা যায়, শিক্ষা-দীক্ষায়, পোশাক-পরিচ্ছদ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-আচরণে। এদের পথিকৃত ও আদর্শ বলে বিবেচিত হলেন অভিজাত ধনাঢ্য ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের স্ত্রী-কন্যারা। যেমন, সেকালের বঙ্গীয় সমাজের সবচাইতে অভিজাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের আধুনিকা নারীর আদর্শ গণ্য করা হয়।

এই সময়ের উদ্দীপ্ত তর্ক-বিতর্কের বিপুল সম্ভার থেকে এই কথা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, সমাজ-সংস্কারকেরা স্ত্রী শিক্ষাকে স্বাধীনতার প্রথম ধাপ গণ্য করেছিলেন এবং অবরোধমোচনের প্রশ্নটি এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। নারীর পরাধীনতা ও স্বাধীনতার কাহিনী গঠিত হল কিভাবে অবরোধ ও পর্দা মোচন করে নারী শিক্ষা ও কর্মজীবনে প্রবেশ করতে সমর্থ হল তা ওপর যেখানে অনাত্মীয় পুরুষের সাথে তাদের মেলামেশা করা প্রয়োজন হয়।

এই তর্ক-বিতর্কের প্রধান সুর হল, ঐতিহ্যিক সমাজকে দোষারোপ। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকা রক্ষণশীল সমাজের সাথে নতুনকে স্বাগত জানানো উদার হয়ে ওঠা সমাজের সংঘাত। এতে করে সমাজের আকাঙ্খিত গন্তব্য নির্ধারণ করা হয়, কঠোর অনুশাসনের বাঁধা কাটিয়ে সমাজে রক্ষণশীলতা কমে গিয়ে উদার হতে শুরু করাতে, যাকে মনে করা হল : বৈপ্লবিক। নারীর অবস্থাসহ স্থানিক সমাজের নানাবিধ দুরাবস্থার মূল খুঁজে বের করা হল, নিজের অভ্যন্তরে। ঔপনিবেশিত সমাজ নিজে নিজেই তার দুর্দশার জন্য দায়ী। ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোতে স্থাপিত এই সমাজের স্থানিক প্রথাসমূহ বৈশ্বিক প্রপঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হল। এই ইতিহাসকে রচনা করা হয়েছে প্রগতির একরৈখিক বিবর্তনবাদী ইতিহাস রূপে - বর্বর থেকে সভ্য, অনুন্নত থেকে উন্নত, পশ্চাদপদ থেকে অগ্রসর হয়ে উঠবার কাহিনী দিয়ে; নারীর ইতিহাস হয়েছে, নারী প্রগতির ইতিহাসে, যা মানব প্রগতির মহাবয়ানের অচ্ছেদ্য অংশ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিকথায় লেখেনঃ

আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাইতেন, "তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?" আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মতো নবাবী বন্দোবস্ত ছিলো তা আমার আদবে ভাল লাগিত না। আমার মনে হ'ত এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।... এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত (মুরশিদ ঃ ১৯৯৩ ঃ পৃ.৭৪)।

গোলাম মুরশিদ আবার মুসলমানের এই দোষ খন্ডন করবার চেষ্টা করে লেখেনঃ

মুসলমানরা ভারতবর্ষে আসার আগে থেকেই যে, এদেশে অবরোধ প্রথা ছিলো, তার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং বোঝা যায়, হিন্দু জাতীয়তাবাদের আমলে স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মুসলমানদের কথাটা তিনি জুড়ে দিয়েছেন। সে দিক থেকে তার স্মৃতির সবটা হয়ত অভ্রান্ত নয় (মুরশিদ ঃ ১৯৯৩ ঃ পৃ.৭৫)।

সংস্কারপন্থীদের কাছে স্বাধীনতা, উন্নতি ও পর্দা ভাঙার অর্থ হলঃ ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ভেঙে জুতো পরা, বিশেষ কায়দায় শাড়ী পরা, বাইরে যাওয়া, বিলেত ঘুরে আসা, গাড়িতে ওঠা, ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে হাওয়া খেতে যাওয়া, মঞ্চে অভিনয় করা, পত্রিকায় লেখালেখি করা, সম্পাদনা করা, মহিলাদের সংগঠন করা, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে আলাপচারিতার কায়দা রপ্ত করা ও একত্রে কাজ করা, সভা-সমিতিতে যোগদান করা, বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ প্রকাশ করা ইত্যাদি।[৮] এর সাথে বর্হিজগতে পর্দাপন করে মেয়েদের আয়-উপার্জন করে স্বাবলম্বী হওয়া হওয়ার প্রসঙ্গটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে উত্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে "রক্ষণশীরতা কমে গিয়ে উদার হয়ে ওঠা" - পশ্চাদপদ ঐতিহ্যের 'পর্দা প্রথার উচ্ছেদ বা বিলাপ' প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যাখ্যার প্রধান সুর এটাই; যা ছিল এক ভাবে ঔপনিবেশিক ভাবধারার স্থানিক আত্মীকরণ মাত্র।

অথচ তা যে কেবলই একটি বিশেষ শ্রেনীর নারীদের বিষয়, এসব আলাপচারিতায় সেটি দৃশ্যপট থেকে মুছে গেছে। কৃষক সমাজে, আদিবাসীদের মধ্যে, শ্রমিক শ্রেনীর নারীদের জন্য পর্দার মতাদর্শ পৃথক। পর্দার মধ্যে বাস করা, পর্দানশীন থাকা, ঘরের ঘেরা-বেড়া রক্ষা করা ছিল এক ধরনের শ্রেনী মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। আপামর জনসাধারণ থেকে মর্যাদাব্যঞ্জক দূরত্বের চর্চা। শ্রেনী মর্যাদা, আধিপত্য, নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের শক্তিশালী মতাদর্শ হিসেবে এর চর্চা। এতে করে পর্দা যোগ হয় 'ভদ্রতা'র ধারনার সাথে। পর্দা তখন ভদ্রতার, সম্ভ্রান্ততার লক্ষণ। রুচিশীলতা, মর্যাদাবোধ, শালীনতা আর পর্দা অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক হয়ে উঠেছে। পর্দা হয়ে উঠেছে 'ভদ্রলোক' শ্রেনীর লক্ষণ। ভদ্রলোক শ্রেনীর ভদ্র জীবন চর্চার অঙ্গ বিশেষ। ভদ্রঘরের মেয়ের পরিচয়ের বাহন হিসেবে পর্দা সাধারণ শ্রেনীর

সাথে দূরত্বের প্রতীক হয়ে কাজ করে। সেটা কেবল পুরুষের সঙ্গে নারীর পরিসরগত দূরত্বই নয়, সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া 'মেয়েছেলে', 'মাতারি', 'ছেমরি'র সাথে তা 'ভদ্রমহিলা'র শ্রেনীর সমীহ সৃষ্টিকারী দূরত্ব রচনা করে দেয়। উঁচু ও নীচু শ্রেনীর পুরুষের সাথে পর্দার আচরণ ভিন্ন। পর্দার দ্বারা উঁচু শ্রেনীর নারী তার শ্রেনী পরিচয়ের আধিপত্য ও আভিজাত্যের গৌরবকে ধারণ ও প্রকাশ করে। এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবীদার হয়। যে কারণে দরিদ্র পরিবারে অবস্থা একটু ভাল হলে বোরখা ব্যবহার, থাকার, গোসলের পৃথক পরিসরের আয়োজন করে। অন্যদিকে, দরিদ্র নারীদের অভিজাত নারীর অনুসরনে বোরখা কিংবা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করা উচ্চ সমাজ 'জাতে ওঠা'র চেষ্টা হিসেবে বিরক্ত বোধ করে।

৩. ভিক্টোরিয় পর্দা এবং ভূমিজদের ভদ্রতা শেখার কিচ্ছা

ইউরোপীয় রেনেসাঁর জমকালো ইতিহাস খোদ পশ্চিমের নারীর আদৌ কোন ইতিবাচক নবজন্ম ঘটিয়েছিল কিনা এমন সন্দেহকে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সাহিত্যের তুলনাত্মক বিচার করে পরীক্ষা করেন ইউরোপীয় ইতিহাসের বিশারদ জোন কেলি। তাঁর বরাতে জানা যায়, আধুনিক সমাজ শৃংখলা সামন্ত মধ্যযুগীয় অভিজাত ও কৃষক নারীর তুলনায় নবজন্মপ্রাপ্ত আধুনিক নারীর সামাজিক যোগাযোগ, চলাচল, গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করে- তার দেহ-মনকে অবরুদ্ধ ও অধীনস্ত করে।[৯] আধুনিক সুশীলন নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কঠোর নিষ্কাম শুদ্ধাচারী ও অবদমনমূলক করে তোলে। নারী ও পুরুষের পৃথক জগতের বিভাজন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে। নারী-পুরুষের পৃথক জগতের পৃথক ভুমিকা, নারীর বর্হিজগত বিচ্ছিন্ন গৃহকেন্দ্রিক জীবনকে বৃটিশ পারিবারিক আদর্শের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভিক্টরিয় গার্হস্থ্য ভাবাদর্শ। ক্যাথরিন হলের "দ্য আরলি ফর্মেশন অব ভিক্টরিয়ান ডমেস্টিক ইডিওলজি" প্রবন্ধে দেখা যায় কিভাবে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে ইভানজেলিক্যালবাদের মত খৃস্ট ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলন মধ্যবিত্ত শ্রেনীর আদর্শবোধ গড়ে তুলেছিল ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য নৈতিকতার পুনঃমার্জনার উদ্দীপনা তৈরি করে।[১০] এর অন্তর্ভূক্ত ছিল নারীত্ব ও পৌরুষের একটি আদর্শ গড়ন গড়ে তোলা যা একদিকে সনাতন কালের চাইতে ভিন্ন, অন্যদিকে তা যুগপৎ ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত অভিজাত শ্রেনী ও নব গঠিত শ্রমিক শ্রেনীর তুলনায়ও স্বতন্ত্র। হল দেখান কিভাবে এ সময় থেকে মধ্যবিত্ত গৃহিণীর ইতিহাসের সূত্রপাত।[১১]

ভারতীয় কিংবা বাঙালী জাতি কল্পনাকালে কল্পিত সম্প্রদায়ের জন্য ঐক্য, সংহতি ও একত্ববোধ এর জন্য একটি অভিন্ন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সন্ধান করা হয়। সেই ঐতিহ্য চলমান জীবন থেকে সরাসরি গ্রহণ নয়, বরং চলমান জীবনধারার সংস্কার করে একটি

জাতীয় ঐতিহ্য, জাতীয় সংস্কৃতির অন্বেষণ করা হয়। এরিক হবসবম এবং টেরেস রেঞ্জার তাদের "দ্য ইনভেনশন অব ট্র্যাডিশন" গ্রন্থে বলেন যে, যা কিছুকে আমরা প্রাচীনকাল থেকে আগত মনে করে থাকি, শাশ্বত, আবহমান, অনাদিকালের বলে থাকি তার বেশির ভাগই বহুকাল থেকে চলে আসা রীতি-রেওয়াজ নয়, বরং খুব কাছাকাছি সময়ের উদ্ভাবন। যেমন ধরা যাক, ওয়েলস ও স্কটিশ "জাতীয় সংস্কৃতি"।[১২] তেমনি করে জাতির সংস্কৃতির উদ্ভাবনকালে নতুন জীবন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি পোষাকও বানিয়ে করে নেবার প্রয়োজন হয়েছে। জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শিক প্রণেতারাই এই বানিয়ে নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার-আচরণের সাথে আধুনিকায়নের একটি অঙ্গ হয়ে এসেছে পোশাক-পরিচ্ছদ। ভদ্রলোক শ্রেনীর আবির্ভাবের আগে যে এক প্রস্থ কাপড় বাঙালী মেয়েদের দেহাবরণ ছিল, তা সভ্য নাগরিক জীবন ধারায় যথার্থ শোভন ও সুশীল বলে বিবেচিত হয় নি।[১৩] আধুনিকের ভিক্টোরিয় নৈতিকতার চোখে, এক কাপড়ে দেহ যথেষ্টভাবে আবৃত করে না। তা লজ্জাস্করভাবে খোলামেলা। এমনকি অভদ্র ও অশালীন। যৌন-শৃংখলার তদারকীর পক্ষে মুশকিলের। পাশ্চাত্যকরণের প্রথম পর্বে সরাসরি গাউন পার শুরু হলেও (যেমন, প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমণকারী ভদ্রমহিলা কৃষ্ণভাবিনী দাস গাউন পরে ভ্রমণ করেছিলেন। ঠাকুর বাড়ির কেউ কেউও এই পোশাক গ্রহণ করেছিলেন। পরে এর ওপর একটা আঁচল জড়াবার চল হয়) পরে স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয়তাবোধের আদর্শ প্রবল হয়ে উঠলে ব্রাহ্ম সমাজের বৌদ্ধিক ও নৈতিক নেতৃত্বে স্বদেশীয়ানার ভাব ও দেশজ সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে ফরাসী দোকানে ফরমাশ দিয়ে তৈরি কিম্ভূতকিমাকার 'অরিয়েন্টাল ড্রেস' ছেড়ে শাড়িকেই আধুনিকতার ভাবে ও ভঙ্গীতে রূপান্তিত করা হয়। এক প্রস্থ শাড়ীর আদিমতা ও শৃংখলাবিহীনতাকে পরিশীলন ও সভ্যকরণ না করে তাই কোনভাবেই আধুনিকতার ঔপনিবেশিক প্রকল্পের অংশীদার হওয়া সম্ভব ছিল না। এই মুশকিল আসান করে ভদ্র সমাজে চলাফেরার জন্য পোশাক পরবার অভিনব কায়দা আবিষ্কার করা হয়েছিল আরও কয়েক প্রস্থ নতুন পোষাকে দেহকে যথেষ্টভাবে ঢাকাঢাকির ব্যবস্থা করে।

এভাবে দেহকে, দেহভঙ্গীর প্রকাশকে উপনিবেশের শৃংখলার অধীন করে তোলা হয়েছিল। ব্লাউজ পেটিকোটের সমন্বয়ে শাড়ী পরবার যে সংস্কৃত আধুনিক রীতি (শাশ্বত বাঙালী নারীর শাড়ী বলে যা আজ নাগরিক সমাজে সমাদৃত) তা ব্রাহ্মিকা শাড়ী নামে প্রচলিত কায়দারই এক সংস্করণ। এই ভদ্র পোশাকের প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন কলকাতার বিখ্যাত অভিজাত জোঁড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানদান্দিনী দেবী। পার্সি পরিবার থেকে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শাড়ী পরবার এই বিশেষ ঢঙ পরবর্তীকালে বাঙালী নারীর সৌন্দর্য, শালীনতা ও আধুনিকতার প্রতীক হয়ে ওঠে। বামাবোধিনী পত্রিকায় (১৮৭১) এই পোশাক কি রকম, কিভাবে পরতে হবে তা নিয়ে তার পরামর্শমূলক চিঠিও ছাপা হয়। এতে বলা

হয়, যে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা জুতো, মোজা, বডিস, ব্লাউস, পেটিকোট সহ শাড়ী পরেন এবং বাইরে যাবার সময় এসবের ওপর একটা চাদর জড়ান। এই ধরন ছিল সভা-সমিতি, ভোজসভা, নিমন্ত্রণে অতিথি-অভ্যাগতদের সাথে পশ্চিমা এটিকেট বা আদব-কায়দার সংমিশ্রণে কেতাদুরস্ত হওয়ারই অঙ্গ। মাথায় 'ভালমত ঘোমটা' না দেয়া, কাটা কাপড় পরা, নভেল পড়া, কনসার্টিনা বাজাতে পারা এক নতুন ধরনের জীবনধারার প্রকাশ, যাতে শরীর একটি শৃংখলায় আবৃত হয়। আব্রু-আবরণ, আবডাল, গোপনীয়তার অর্থের রূপান্তর ঘটে যায়।

৪. জাতীয়তাবাদী বাছাই নীতি ও দেশজ আধুনিক নারীত্বের গঠন

ঐতিহ্যকে প্রগতির অগ্রযাত্রায় বাঁধার বিন্ধ্যাচল বলে চিহ্নিত করে পশ্চিমা ভাবধারার প্রাথমিক আসক্তি ও বৈপ্লবিক সংস্কারের জোয়ার কিছু সাফল্য অর্জন করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এসে ভাটার মুখে পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভাবধারা দানা বেঁধে উঠে পশ্চিমি আধুনিকতার পুনর্পাঠ দাঁড় করায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ "কলোনিয়ালিজম, ন্যাশনালিজম, এন্ড কলোনাইজড উইমেন ঃ দ্য কন্টেস্ট ইন ইন্ডিয়া" তে বলছেন যে, জাতীয়তাবাদী নতুন এক রাজনীতি অতীত ভারতের সবকিছুকেই এক স্বর্ণযুগের উৎকৃষ্টতার নিদর্শন করে পরিবেশন করে এবং যা কিছুই ঐতিহ্যবাহী সবকিছুর মধ্যে ভাল খুঁজে পেতে থাকে (চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৯৮৯, ১৯৯৩)।[১৪] জওহরলাল নেহেরুর "ভারত সন্ধানে" গ্রন্থটিতে কিংবা রবীন্দ্রনাথের তপোবনের ভাবনাতেও পার্থের এই বক্তব্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। প্রাক-বৃটিশ ভারত হল এক অবক্ষয়িত সমাজ যার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবার দায় জাতীয়তাবাদীদের। সংস্কার যার অঙ্গ। পার্থ, সুমিত সরকারের সাথে একমত হয়ে যে জায়গাটি আমাদের উপলব্ধি করতে সহায়তা করছেন যে, ইউরোপীয় উদারনৈতিক ভাবধারা গ্রহণে নবজাগরণের বৈপ্লবিক সংস্কারকেরাও ইউরোপীয় উদারনৈতিক ভাবধারা গ্রহণকালে কিভাবে সাংঘাতিক রকমের বাছ-বিচার করেছিলেন। সংস্কারের সময় আসলে তারা কতগুলো বিষয় অক্ষুন্ন রাখবার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। যেমন ধরা যাক ঃ বর্ণ স্বাতন্ত্র, পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব (সম্ভবতঃ পুরুষতান্ত্রিক), শাস্ত্রীয় অনুমোদোন বজায় রাখা। এদের আকাঙ্খার মধ্যে সামাজিক রেওয়াজের বাস্তব পরিবর্তনের চাইতে প্রতীকি পরিবর্তনই ভালভাবে লক্ষ করা যায়। পার্থের কৌতুহল হল যে, এদের সেই ছাঁকনিটি কেমন ছিল, যা দিয়ে তারা ইউরোপীয় ভাবধারা থেকে ছেঁকে ছেঁকে গ্রহণযোগ্য অংশকে পৃথক করেছিলেন। আধুনিক সমাজের নারীর অবস্থান কি হবে এই নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নটির সমাধান করা হয় আধুনিকতা সাথে একাকার হয়ে নয়, বরং পৃথক হয়ে। একে সমাজের একটি গভীর অন্তর্জগতে এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যেন তা

বর্হিজগতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সাথে মোকাবেলার জগত থেকে বহু দূরে একটি পবিত্র, বিশুদ্ধ, স্বাধীন জগত। স্বদেশীয়তার পরিচয়কে বহন যার কাজ।

এই বাছাইয়ের নীতির মধ্যেই জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের পরিকাঠামোতে নারী অবস্থান প্রশ্নের বিবেচনা আধুনিক জাতি গঠনের আকাঙ্খায় নতুন রাষ্ট্রে লিঙ্গীয় সম্পর্ককে গঠিত করে। ঐতিহ্যের গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রকল্পে উদারনৈতিকতা ও আধুনিকতা প্রত্যাখাত হয়নি; উল্টো এর সাথে সামঞ্জস্য বিধানের গ্রহণ-বর্জনের বাছ-বিচারের একটা মতাদর্শিক নীতির যোগান দেয় জাতীয়তাবাদী অধিকল্প। এই অধিকল্পে ঔপনিবেশিক কাঠামোর ভেতর স্বদেশীয় রীতি-নীতির আবশ্যিক সংস্কার এমনভাবে আধুনিকতামুখী করে তোলা হল যা আবার পশ্চিমের থেকে একটা স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়কেও তুলে ধরবে। এটা সম্ভব করতে জাতীয় সংস্কৃতিকে বস্তুগত ও আত্মিক এই দুই স্ব-শাসিত মহলায় ভাগ করে ফেলা হল। বস্তুগত জগতে যুক্তিশীল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ে জগত জোড়া পাশ্চাত্যের আধিপত্য নিরংকুশ এবং এর কাছ থেকে সকলকেই এই শ্রেষ্ঠ পন্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাচ্যের এবং এর জাতীয় সংস্কৃতির আসল পরিচয় এখানে। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ একে অন্দর-বাহির বা ঘর-বাহিরের ধারনায় অনুবাদ করে নেয়। বাইরের পার্থিব জগতে থাকতে পারে ব্যর্থতা-ক্লেদ-গ্লানি-খেদ-জীবন সংগ্রামে আপোষ আর ঘর থাকবে নৈতিক পরিশুদ্ধি, নিজের পরিচয়ের খাঁটিত্ব পবিত্র পরিসর হয়ে। প্রথম জগত পুরুষের কর্কশ সংগ্রামের আর দ্বিতীয়টি নমনীয় কোমল শুদ্ধতার প্রতীক নারীর। হরিপদ কেরানীর নিস্ফল জীবনে যেমন পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর। নারী ঐতিহ্যের খাঁটি ধারক ও বাহক। অমিশ্র খাঁটি ভারতীয়ত্বের প্রতীক হিসেবে নারীর জীবনাচরণ তাই জাতীয় সংস্কৃতির ভাবনাতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

আধুনিক নবীনা নারীকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল যাতে তারা একটি ভিন্ন ধরনের নারীত্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের সাথে আধুনিকতার একটি সঙ্গতি ঘটাতে পারে। এরা প্রাচীনা অশিক্ষিত, অশীলিত, ঈর্ষাপরায়ণা নারীদের থেকে পৃথক এবং ছোটলোক শ্রেণীর কর্কশ, স্থুল, উঁচু গলা ঝগড়াটে নারীর বিপরীত। উভয়ের দিক থেকে সৌন্দর্য, নৈতিকতা, যৌন পরিশুদ্ধিতায় একটি সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। দেশজ পুরোনো পিতৃতন্ত্রে কর্তৃত্ব বিচ্ছিন্ন করে নবীনা আধুনিক নারীকে জাতীয় সংস্কৃতিতে অর্ন্তভূক্ত করবার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুক্তিশীল নবগঠিত পুরুষতন্ত্রের অধীনস্ত করে তোলা হয়। এর অন্তর্ভূক্তির প্রক্রিয়া হল নারীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হওয়া আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনাচরণ। যাতে করে উচ্চ শ্রেনীর দেশজ নারীরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ভদ্রমহিলায় রূপান্তরিত হল, যাকে জাতীয়তাবাদীরা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করেছে।

নব্য আধুনিকা নারীকে পরিশীলন ও মার্জনার মাধ্যমে এমনি একটি আদর্শ রূপে তৈরি করা হল, যে, মুর্খ প্রাচীনা এবং মেমসাহেবীপনা উভয়ের চাইতে সাংস্কৃতিক উৎকৃষ্টতার দাবীদার এবং নিম্নশ্রেনীর (ছোটলোক, ইতর, মাতারি, মাগী, চাষা-ভূষা) নারীদের চাইতে স্পষ্টভাবে আলাদা। এরা হলেন ভদ্রমহিলা (মিস বা মিসেস, গুহ/চৌধুরী/ইসলাম)। এতে করে এমন একটি নারীত্বের আদর্শ তৈরি হল (নারীধর্ম) যাতে করে আর পূর্ববর্তী ধরনের **স্থানিক** অবরোধের পরিসীমা ভেঙে পড়ে এবং পর্দার রীতি-নীতির কঠোরতা একটা **বিশেষ অর্থে** নমনীয় হয়ে আসে, আবার আরেক অর্থে শক্তিশালী হয়। পরিব্যপ্ত হয় সর্বত্র। নব্য মহিলা জনসমক্ষে যাতায়াত করে; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়, পোস্ট অফিসে গিয়ে প্রবাসী বা নগরবাসী স্বামীর কাছে চিঠি পাঠায়।[১৫] কিন্তু বর্হিজগতে এই চলাচল একটি নিজস্ব পরিসীমার মধ্যে অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী সীমানা প্রাচীর তুলে দিয়ে। এই সীমানা প্রাচীর আগের মত আর কোন সত্যিকারের দেয়াল দিয়ে আর দেখা যায় না। অবরোধ স্থানান্তরিত হয় বিভাজিত জগতের শক্তিশালী, অথচ অদৃশ্য ভাবধারায়। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গীতে পুরুষের সাথে একটি পৃথক জগতের সীমা রক্ষা করবার মধ্য দিয়ে। এই সীমানা রক্ষা করা হতে থাকে জীবন-যাপনের সকল ক্ষেত্রে। এমনকি যখন সাহিত্য চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের লেখালেখির মাধ্যমে নারীর জনজীবনে আত্মপ্রকাশ করতে পারাকে একটি বড় রকমের অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, স্বাগত জানানো হচ্ছে তখনও সেই লেখার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে একটি পৃথক ধরনের "নারীসুলভ" অর্থাৎ মানের দিক থেকে কাঁচা, অপরিণত, অভিভাবকত্বপূর্ণ সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভের যোগ্য হিসেবে আলাপ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" এ চারুলতার লেখালেখি প্রতি অমলের মনোভাব এর টিপিক্যাল একটি উদাহরণ। মেয়েদের লেখার ক্ষেত্রেও আশা করা হবে যে, তা নিজস্ব একটি ভাষাগত শুদ্ধির চর্চা করবে। রুচি, শালীনতা, সম্ভ্রম, ভদ্রতাবোধের সম্মিলনে ভদ্র মহিলার মুখের ও লেখবার ভাষাকে অবশ্যই একটি নৈতিক ছাঁকনির মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও সুশীল হতে হবে। প্রাচীনা কিংবা ছোটলোকের মত করে ভদ্র মহিলারা কখনও এমন কিছু শব্দ বা পদ ব্যবহার করতে পারবেন না যাতে কোন কামনা, বাসনা বা যৌনতার ছাপ থাকে। রঙ্গ-রস, হাসি-তামাশার মধ্যেও যার চলন ছিল তা-ও একেবারে আটকে পড়ে গেল। আধুনিকা, শিক্ষিত নব নারী হয়ে উঠবার জন্য তা ছিল অপরিহার্য।

পর্দার স্থানগত চরিত্র ভেঙ্গে অদৃশ্য হয়ে উঠে এল ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীতে। আত্মিক শুদ্ধতা রক্ষার দাবী বর্তায় এই নারীত্ব বহনে, এর পুনরুৎপাদনে।[১৬] এই পুরুষতন্ত্র আধিপত্য চর্চার সকল ধরনে কর্তৃত্বের বল প্রয়োগে অধিকতর সূক্ষ্ম প্ররোচনার সম্মীলন ঘটায়। কামনা-বাসনায় বিপজ্জনক পুরোনো নারীত্বকে পুনর্বিন্যস্ত করে তার সক্রিয় যৌনসত্ত্বাকে মুছে ফেলে অযৌন, নম্র, আত্মত্যাগী, ধর্মনিষ্ঠ, স্নেহপূর্ণ, গৃহকর্মনিপুণ গৃহলক্ষী, দেবী ও মাতৃকার মূর্তি আরোপ করে জাতি কল্পনা করা হয়। ড্যাগমার এঙ্গেলসের মত পশ্চিমের অনেক

চিন্তক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এইভাবে যে, যেখানে পশ্চিমা দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদ পিতৃভূমির রূপকে স্থাপিত হয়েছে, সেখানে কিভাবে ভারতের মত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী দেশ কল্পনায় হয়েছে মায়ের মূর্তিতে, মাতৃভূমি হিসেবে (এঙ্গেলসঃ ১৯৯৬ : পৃ :VII)। একবার এই নতুন নারীত্ব গঠন হবার পরে নারী নতুন নারীত্বের ও পৌরুষের যে শুদ্ধকৃত, নৈতিক ভাবধারা গড়ে তোলা হয়, নারী তারই ভেতর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।[১৭]

কিন্তু আবার এর ব্যত্যয়ও ছিল। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির চাহিদায় ইউরোপীয় মঞ্চনাটকের আদলে গড়ে ওঠা জাতীয় রঙ্গমঞ্চের পেশাদারী অভিনয়ে প্রসিদ্ধ নটি বিনোদিনী ভাষা ও ভাবধারায় নব্য ভদ্রমহিলার অনুরূপ হলেও সম্পর্কের নৈতিক পরিসীমায় মধ্যে অবস্থান না করাতে জাতীয়তাবাদী মুক্তির প্রকল্পে সেই মর্যাদা প্রবঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হন; হয়ে ওঠেন "অন্য নারী"।[১৮]

৫. পর্দার আজগুবীকরণ এবং বাংলাদেশে পর্দা নিয়ে কথা বলবার বিপদ

ঔপনিবেশিক বিদ্যার প্রাবল্যে ও দাপটে রচিত "ঐতিহ্যের অচলায়তনী খোলস' এর কল্পনা এবং সেটা ভাঙার এমন একটা উদ্দীপনা তৈরি হল যে এতে ঔপনিবেশিক ভাবধারায় অন্ত র্ভূক্তিকরণের প্রক্রিয়ার পুরোটাই অদৃশ্য থাকল। যেমন, বোরখার মত একটি পোশাক নিতান্তই যে আধুনিককালের আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ফসল, যার আশ্রয়ে নারী নবগঠিত বহির্জগতে পা ফেলতে পারে, তাকেই আজগুবী ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অবরোধ ও পর্দাকে অপর অনেক প্রাচ্যদেশীয় রেওয়াজের মত আজগুবী ও উদ্ভটকরণ করে তার থেকে পরিত্রাণের দাওয়াই আবিষ্কারের ঝোঁক দেখা যায়। পর্দাপ্রথার এই আজগুবীকরণই পর্দাকে নিয়ে আজকের সমস্যার কেন্দ্র, যা ঔপনিবেশিক বিদ্যার নিজস্ব কৃতিত্ব। মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়ায় আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মুসলিম প্রধান অঞ্চলে নারীদের অবরোধ ও পর্দার রেওয়াজ যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য যতই পৃথক পৃথক হোক না কেন, ঔপনিবেশিক বিদ্যার আচ্ছন্নতায় সবই এক। বড়ই আজব, অদ্ভুত বলে দেখা যায়। এই আজগুবীকরণ প্রাচবাদী।

বাঙালী মুসলমান নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিকাশ যেমন বিলম্বিত হয়েছিল, তেমনি মুসলমান নব্য মহিলাদের আবির্ভাবও বিংশ শতাব্দীর আগে স্পষ্ট হয় নি। বাঙালী মুসলমানদের বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রবেশকালীন পর্যায়ে প্রত্যাখ্যান, প্রতিরোধ, অভিযোজন, খাপ খাওয়ানো, অন্তর্ভূক্তির মধ্য দিয়ে পর্দা আসে একটি নতুন ধারনা হয়ে। এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ে ধর্মের পুনঃপুন ব্যাখ্যা হাজির করবার মধ্য দিয়ে। এই ব্যাখ্যা আলেম-উলেমা-মাশায়েখ, পীর-ফকির-দরবেশ প্রভৃতি ধর্মবেত্তারা যেমন হাজির করেছেন, তেমনি হাজির করেছে পশ্চিমি জ্ঞানালোকিত নাগরিক বুদ্ধিজীবি মহল, সমাজ-সংস্কারককের

দল, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক, গ্রাম্য মোল্লা-মৌলভী-মাওলানা, গেঁয়ো চাষা-ভূষা, ঘরের মা-খালা-দাদী-নানী, বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ির লোক, আপামর জনসাধারণ। এই আলোচনা জনবিতর্কের প্রবল হয়ে উঠে এসেছিল এমন একটা বিশেষ ধরনের সমাজ রূপান্তরের সন্ধিকালে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেনী গড়ে উঠছে। পুরোনো শরীফ মুসলমানদের থেকে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেনীর আবির্ভাব ঘটে চাকুরী-বাকরী ও ছোট-খাট ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে, যারা প্রথমে কলকাতা ও কিছু মফস্বল শহরে এবং দেশভাগ পরবর্তীকালে নতুন রাজধানী ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে গঠন করে আধুনিক একক পরিবার।

প্রথম বাঙালী মুসলমান সংসদ সদস্য শায়েস্তা ইকরামুল্লাহর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম দেন "পর্দা থেকে পার্লামেন্ট"। পর্দা হল একটা আদি যাত্রাবিন্দু। প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা তাহেরন নেসার রচনা একটি বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হয়।[১৯] সাহিত্য চর্চা, লেখালেখি প্রকাশ করা পর্দা সরিয়ে জনজীবনে প্রবেশ ও আত্মপ্রকাশের চিহ্ন গণ্য করা হয়। কিছু কিছু পত্রিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এর 'সওগাত' এর মত কিছু আধুনিক উদারনৈতিক পত্রিকায় নারীদের লেখা ছাপানো হতে থাকে। সুফিয়া কামালদের আবির্ভাব ঘটে। নাসির উদ্দিনের কন্যা বেগম নূরজাহান সম্পাদিত বিশেষভাবে নারীদের পত্রিকা "বেগম" এর মত স্থানে বাঙালী মুসলিম নারীদের বিশেষ সাহিত্য সম্ভার গড়ে ওঠে। হালের পত্রপত্রিকার নারী পাতার সৃষ্টিও একই পারম্পরিক ভাবধারায়।

ভদ্রলোক শ্রেনীর গঠনের সাথে গড়ে ওঠা ভদ্রমহিলাদের পরিমার্জিত জীবন ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের পুরোনো পরিসর ভেঙে নতুন পরিসরে বিন্যস্ত হয়। ঔপনিবেশিক সংস্পর্শে আসবার আগে নারীর চলাচল ও সামাজিক গতিশীলতার ওপর নিয়ন্ত্রণে অবরোধ ও পর্দার চর্চার অর্থ ঔপনিবেশিক কালে বদলায় ঔপনিবেশিক বিদ্যা আয়ত্ব করবার মধ্য দিয়ে, সাহিত্যের মাধ্যমে, ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গিয়ে, বিয়ে ও পরিবারের সংস্কারের ভেতর দিয়ে। তাতে একটা বড় ভূমিকা রাখে নতুন নুতন আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সমূহ। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহের আধুনিক জাতীয়তাবাদী চরিত্র এই রূপান্তরে আরেক গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়ানকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সমাজের অভ্যন্তরে এর যে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল সমাজের অন্তর্জগতে রাষ্ট্রের প্রবল উপস্থিতি। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, অনুসৃত নীতিমালা ও পরিকল্পনা পরিবার ও ব্যক্তির জীবনকে গাঠনিক ভূমিকা রাখতে শুরু করে; সমাজের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে পড়তে থাকে।

বাংলাদেশে এই পর্দা নিয়ে কথা বলবার বিপদটা হল, একটা বিশেষ ঔপনিবেশিক বয়ান এখানে আজ অব্দি কর্তৃত্বশীল বয়ান হয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁড়ে আছে এবং কিতাব তৈরি করে ফেলেছে যা এখানকার মূল কিতাবের মর্যাদা ভোগ করছে। এই বয়ানের একদিকে আছে ঐতিহ্যের সংস্কারবাদী ভাবনার দীর্ঘ ইতিহাস যারা তাদের বিপরীতে দাঁড় করাচ্ছে ঐতিহ্য সংরক্ষণপন্থী পক্ষকে; আর দু'পক্ষকে সমন্বয় করে তৃতীয় পক্ষ কথা বলছে। কিন্তু স্বয়ং 'ঐতিহ্য' এর বয়ান খুলে ঐতিহ্য বানানোর ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়াটাকে খোলাসা করবার আসল কাজটা বাকী পড়ে থাকছে। সেটা পূর্ব-পশ্চিমের শাসনের সম্পর্কের জটিলতর দিক, বাংলার নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব স্থানীয় সম্প্রদায়ের পুরুষতান্ত্রিক শক্তির হাতে কতখানি আর ঔপনিবেশিক, বৈশ্বিক সাম্রাজ্যিক শক্তির হাতে কতখানি কিংবা আদৌ স্থানীয় কোন শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে কিনা, কথাটা হতে পারে সেখানে।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পর্দা ঘেরা আবদ্ধ বন্দীনী অবলা নারীর এই ভাবমূর্তি যে স্বয়ং কলোনিয়াল সেটা অনুধাবনে ব্যর্থতা এখানকার সংস্কারপন্থী নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাতে করে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী পুরুষতন্ত্রের নিগড়ের শক্তিকে খাটো করে দেখে পুরুষতন্ত্রের স্থানিক কাঠামোকে, আরো বিস্তৃতভাবে দেখলে, নিজের সংস্কৃতিকে একটি অভিযুক্ত সংস্কৃতির ভাবমূর্তিতে পরিবেশন করা হয়। নিজেদের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিকৃষ্টতাকে সাম্রাজ্যবাদী নীতির সাথে বিচ্ছিন্ন করে, দায়ী করে দেখবার মনোভঙ্গী গড়ে ওঠেছে। এই মনোভঙ্গী এতই শক্তিশালী ও পোক্ত যে,পর্দা প্রসঙ্গে মুখ খোলা মাত্রই আমরা সহসা ভিন্নভাবে দেখবার ও কথা বলবার ভাষা খুঁজে পাই না। পদ হাতড়াই, বাক্যহারা মুক, মুঢ়, ম্লান মুখ হয়ে থাকি। যদি বা স্বর তুলি, ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতায় আমরা ভুতে পাবার মত বিড়বিড় করতে থাকি শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ভাবে ও ভাষায়। সেই ভাষার ভেতর আমরা অধীনস্ত থাকি এবং অধীনস্ততার পুনরুৎপাদন ঘটতে থাকে এক পরিসর থেকে আরেক পরিসরে।[২০]

বাঙালী নারীর বেশ-ভূষা, গৃহ ও জনজীবনে চলাচলের ধরণে পুরুষের সাপেক্ষে যে পরিসরগত পৃথকীকরণের প্রকৃতি প্রাক-ঔপনিবেশিককালে, মধ্যযুগে কিংবা প্রাচীনকালে কেমন হতে পারে, তা নিয়েও যথেষ্ট আগ্রহ-উদ্দীপক তদন্ত হওয়া সম্ভব। এই পরিসরে আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে ভিক্টোরিয় নৈতিকতাকে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় আত্মীকরণ এবং এই আত্মীকরণের ফলে অর্জিত রূপকে পশ্চাদপদ ও আজগুবী বলে পরিবেশনের মধ্যে। শ্রেনীর আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে বাঙালী ভদ্রমহিলাদের প্রসঙ্গে।

টীকা

[১]প্রচলিত অর্থে পর্দা প্রথা বলতে সাধারণতঃ পুরুষের সাপেক্ষে মেয়েদের একটি পৃথক জীবনাচরণ ও তার সম্পর্কিত মূল্যবোধকে বোঝায়, যাতে একটি পৃথক পরিসরের চর্চাকে নির্দেশ করা হয় যেখানে তারা জনজীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে থাকে। একভাবে একে বলা যেতে পারে পরিসরের লিঙ্গীয় বিভাজন কিংবা লিঙ্গীয় পৃথকীকরণের নীতি ও আদর্শ। পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, চলাচল, ভাববিনিময়ে মেয়েদের পৃথক বিচ্ছিন্ন জগত তৈরি করবার মধ্যে 'পর্দা করা' কে দেখা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। এই লিঙ্গীয় বিভাজন নারীর জীবনে প্রতিবন্ধক এবং এর বস্তুগত ও মতাদর্শিক চর্চা নারীকে অবরুদ্ধ করে ফেলে - মোটামুটি এ ধরনের একটি ভাবনার আবিষ্টতা আধুনিকতার একটি আবশ্যিক অনুসঙ্গ।

[২]যেমন, জার্মান গবেষক ড্যাগমার এঙ্গেলস ১৮৯০-১৯৩৯ সময়কালের বাঙালী নারীদের প্রসঙ্গে লেখেন "As we shall see Purdah did not only mean secluding women behind veils or walls, but entailed an all- encompassing ideology and code of conduct based on female modesty which determined women's lives wherever they went", পর্দা ও তৎকালীন নারীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড বিশেষণে তিনি এভাবে উপসংহারে টানেন, "I have illustrated the power of purdah by examining how far purdah values determined women's activities, even under conditions which seemes in the apparent contradiction to these values." (Engels: 1996: p.2, 35)

[৩]এ রকম দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ হিসেবে দেখুন, Santi Rozario (2006)- The New Burqa in Bangaldesh: Empowerment or Violation of Women Right?, Women's Studies International Forum, School of Religious and Theological Studies, Cardiff Universiti, Wales, UK. www.elsevier.com/locate/wsif । কিংবা আরেকটি লেখা, Hilsdon, Anne-Marie & Rozario, Santi (2006)-Special Issue on Islam, Gender and Human Rights in www.elsevier.com/locate/wsif. ওয়েলসের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি রোজারিও এবং অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান ম্যারি হিলসডন বোরখা ব্যবহারকে দেখছেন নারীর ক্ষমতায়ন অথবা অধিকার হরণের দৃষ্টিকোন থেকে।

[৪]হবসবম যাকে বলছেনঃ ঐতিহ্য আবিষ্কার। দেখুন, Hobsbawm and Ranger: 1983

[৫]উদাহরণ হিসেবে, চিত্রকলায় ওরিয়েন্টালিস্ট বেঙ্গল স্কুলের স্বদেশীয়ানার রোমান্টিক আবিষ্কারে লজ্জাভারনত ঘোমটাআবৃত নারীমূর্তিকে কিংবা সাহিত্যে ঘোমটা, আঁচলকে দেশীয়ানার আবেগীয় প্রতীকে ধারণ করা হয়েছে। আবার বিদ্রোহের প্রতীকেও এসেছে ঘোমটার উচ্ছেদ : "মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী/খুলে ফেল ও শিকল/যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু/ওড়াও সে আবরণ/দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন/ওই যত আভরণ।" - ইত্যাদি।

[৬]সেকালের কলকাতার অভিজাত পরিবারের অন্দর মহল সম্বন্ধে লেখালেখিতেও স্বাধীনতা ও নারী জাগরণের একই ধরনের মনোভাবের চিত্র ছড়িয়ে আছে। চিত্রদেবের লেখালেখি এর উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে (দেবঃ ১৯৮৪ঃ ৪৬, ২০০৩)। যেমন তিনি বলছেন, "নবযুগের সোনার কাঠির ছোঁয়া সবচেয়ে বেশি লেগেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে" ..... ইত্যাদি ইত্যাদি।

[৭]সোনিয়া নিশাত আমিন তার পি.এইচ.ডি গবেষনায় দেখিয়েছেন কিভাবে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকে পাশ্চাত্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবন-যাপন রীতির পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ঘটেছিল। এই অভিসন্দর্ভটি

পুস্তাকারে দেখুন, আমিন, সোনিয়া নিশাত, অনুবাদ: পাপড়ীন নাহার -বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

[৮]লক্ষ্যণীয় যে, পর্দার মূল্যবোধ নারী স্বাধীনতার এই গোটা আলোচনা জুড়ে একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রথম নারী আত্মজীবনী লেখক রাসসুন্দরী দেবীর (১৮০৯-১৯০০) রচনাকেও নারীর বাইরে আসবার সংগ্রাম ও পথিকৃত কণ্ঠস্বর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[৯]দেখুন, Jhone Kelly- Does Women hava a Renaissance?

[১০]দেখুন, Hall, 1992:75-93

[১১]দেখুন, Hall, 1992:pp. 43-74

[১২]দেখুন, Hobsbawm and Ranger: 1983

[১৩]ছিল একপ্রস্থ হ্রস্বদৈর্ঘের কাপড়; অনেক অঞ্চলে একে তবন বলা হত। এখনও বাইরে পরবার জন্য শাড়ী ও ঘরে পরবার জন্য কাপড়। তখনকার প্রচলিত শাড়ি প্রসঙ্গে এই মনোভাব আবারও চিত্রাদেবের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে: "বেশিরভাগই খুব মিহি জমিনের - শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠত শরীরের আভাস- বুক পর্যন্ত ঘোমটা টানতে গিয়ে অনেক সময় পিঠটা অনাবৃত হয়ে যেত। এই পোশাক পরে কি ভদ্র সমাজে বেরোনো যায়?" (দেবঃ ১৯৮৪ঃ ৫২) তবে মিহি জমিনের শাড়ী যে উচ্চশ্রেনীর পরিধেয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। নিম্মশ্রেনীতে ছিল মোটা কাপড়।

[১৪]প্রবন্ধটি ১৯৮৯ সালে আমেরিকান এথনোলজিস্ট এ প্রকাশিত হয়, পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে তার "দ্য ন্যশন এন্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস" গ্রন্থে "ন্যশন এন্ড ইটস উইমেন" অনুচ্ছেদে নতুন একটি ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয (Chatterjee:1993) ।

[১৫]তৎকালীন আধুনিক মুসলিম পরিবারে মেয়েদের জন্য লিখিত জনপ্রিয় ধর্মীয় ব্যখ্যামূলক গ্রন্থ "বেহেশতী জেওর" এ কিভাবে পোস্ট অফিসে চিঠে পোস্ট করতে হয় তার সবক দেয়া হয়েছে (থানভি ঃ১৯৯০)।

[১৬]পার্থ বলছেন: "Each of these capitulations now had to be compensated for by an assertion of spiritual purity on the part of women, They must not eat, drink, or smoke in the same way as men; they must continue the observance of religious rituals that men were finding difficult to carry out; they must maintain the cohesiveness of family life and solidarity with the kin to which men could not now devote much attention. The new patriarchy advocated by nationalism conferred upon women the honor of a new social responsibility, and by associating the task of female emancipation with the historical goal of sovereign nationhood, bound them to a new, and yet entirely legitimate, subordination." ibid:pp130.

[১৭] নারীত্বের ধারনার নির্মাণ প্রসঙ্গে পার্থের বিশেষণ এরকম "... she would also need to have some idea of the world outside the home, into which she could even venture as long as it did not threaten her femininity, It is this latter criterion, now invested with a characteristically nationalist content, that made possible the displacement of boundaries of the home from the physical confines earlier defined by the rules of Pudah to a more flexible, but nonetheless culturally determinate, domain set by *difference* between socially approved male and

female conduct.Once the essential femininity of women was fixed in terms of certain culturally visible spiritual qualities, they could go to school, travel in public conveyances, watch public entertainment programs, and in time even take up employment outside home. But the "spiritual" signs of her femininity were now clearly marked – in her dress, her eating habits, her social demeanor, her religiosity" (Chatterjee:1993:p. 131)

[১৮]দেখুন পার্থের ভিন্ন আর একটি লেখায়, Chatterjee: 1993:pp.151-157

[১৯]দেখুন, মুরশিদ:১৯৯৩, পৃ.৮৯।

[২০]এই প্রবন্ধটি লেখা শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালের শেষে। শুরুতে হাল আমলের হাকিকত নিয়ে লিখবার পরিকল্পনা থাকলেও বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও পড়াশোনা অগ্রসর হলে তা আমাকে উনবিংশ শতাব্দীর দিকে ঠেলে দেয়। লেখাটি প্রস্তুতকালে আমার শিক্ষক ও সহকর্মী রেহনুমা আহমেদ, সাঈদ ফেরদৌস এবং মির্জা তাসলিমা সুলতানার বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, সমালোচনা বিষয়টি নিয়ে আমার চিন্তাকে একটি গভীরতর স্থলে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। উনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজ সম্বন্ধে ধারনা লাভ 'করতে' আমি গোলাম মুরশিদ, সোনিয়া নিশাত আমিন ও পার্থ চট্টপাধ্যায়ের কাছে ঋণী।

তথ্যপঞ্জী

মুরশিদ, গোলাম ১৯৯৩, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, নারী প্রগতির একশো বছর*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

মুহাম্মদ, আনু ১৯৯৯, নারীর বোরখা বোরখার নারী, *অন্যন্যা* ,ঈদ সংখ্যাতে, ঢাকা:অনন্যা.পৃ. ১৯-২২'

আমিন,সোনিয়া নিশাত ২০০২,*বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* ১৮৭৬- ১৯৩৯, অনুবাদ: পাপড়ীন নাহার, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

দেব, চিত্রা ১৯৮৪,*অন্তপুরের আত্মকথা.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

দেব, চিত্রা ২০০৩.*ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহল.* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

Ahmed, Rahnuma 2000. *"Women's Awakening": The Construction of Modern Gender Differences in Bangali Muslim Society in* এস এম নুরুল আলম, আইনুন নাহার, মানস চৌধুরী (সম্পা.) সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : নৃবিজ্ঞান বিভাগ,পৃষ্ঠা: ১০৯-১৩২

Alloula, Malek 1986. *The Colonial Harem.*Translation: Myna Godzich and Wlad Godzich, United Kongdom: Manchester University Press

Chatterrjee, Partha 1993. The Nation and Its Women/Women and the Nation in *The Nation and Its Fragments,Colonial and Post Colonial Histories*. New Dehli: Oxford University Press, pp.116-157.

Chakrabarty, Depesh 1994.The Difference-Deferral of a Colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British India in Arnold, David and Hardiman, David (eds.) *Subaltern Studies VIII*, Delhi:Oxford University Press

Jeffery, Patricia 1979. *Frogs in a Well, Indian women in Purdah*, New Delhi: Vikas Pulishing House

Marnissi, Fatema- Beyond the veil

Hall, Cathherine 1992. *White, Male and Middle Class, Exploration in Feminism and History*,UK: Polity Press

Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence eds. 1983. *The Invention of Tradition*,Cambridge: Cambridge University Press

Thanvi, Maulana Asraf Ali 1990. *Bahiishti Zewar or Heavenly Ornament*, Translation by Maulana Farid Uddin, New Delhi:Taj Company

Kotalava,Jitka 1993. *Belonging to Others, Cultural Construction of Womenhood in a Village in Bangladesh,* Dhaka: University Press Limited

Engels Dagmar 1999.*Beyong Purdah? Women in Bengal 1890-1930*,Delhi:Oxford University Press

Siddiqi,Dina M 1992. *The Articulation of Gender Ideology and nationalism among Muslims in Nineteenth Century India*. In B.K.Jahangir ed., The Journal Of Social Studies 57. Dhaka:CSS.pp.50-64